নারীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে

প্রভাস ঘোষ

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন
(এ আই এম এস এস)

Narimukti Andolan Prosange – Provash Ghosh

নারীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে — প্রভাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩১ মে, ২০১৩

প্রকাশক ঃ ভারতী রায়
অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন
৭৭, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ৫ টাকা

আমাদের কথা

সাম্প্রতিককালে সমগ্র দেশ জুড়ে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ-গণধর্ষণ বেড়ে চলেছে। এরই প্রতিবাদে এবং সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের দাবিতে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কেরালার ত্রিবান্দ্রম শহরে। ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি, ২০১৩ — এই তিনদিনের সম্মেলনের তৃতীয় দিন প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর বক্তব্য প্রথমে গণদাবী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। পাঠকদের অনুরোধে আমরা তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করছি। এই পুস্তিকা প্রকাশের সময় সাধারণ সম্পাদক বক্তব্যে কিছু সংযোজন করেছেন। আশা করি যে, বাংলার ঘরে ঘরে এই বই পৌঁছবে এবং নারীমুক্তির আন্দোলনকে সঠিক দিশা পেতে সাহায্য করবে। মূল ইংরেজি ভাষণের বাংলা অনুবাদজনিত কোনও ত্রুটি থাকলে, তার দায়িত্ব আমাদের।

৩১ মে, ২০১৩
৭৭, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩

সুজাতা ব্যানার্জী
সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

নারীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে

সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

আমি প্রথমেই বিদেশ থেকে আগত সমস্ত প্রতিনিধিদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। কমরেডস, মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাজ্য বাদে প্রায় সমগ্র ভারত থেকে প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন। আপনারা এ দেশের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিতা মহিলাদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এমন একটা সময়ে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন, যখন আমাদের দেশে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র— রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক জীবন চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত। এর প্রতিকারের জন্য এবং মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সহ সমগ্র সমাজের অগ্রগতির স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনারা অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ডাকে সাড়া দিয়ে এই সম্মেলনে এসেছেন।

আপনারা জানেন, শাসকগোষ্ঠী গর্বের সঙ্গে দাবি করে দেশ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। কিছুদিন আগে তাঁরা সাড়ম্বরে ৬৪তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করেছেন। অনেকটা পূজা-পার্বণের মতোই তাঁরা ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করে থাকেন এবং অগ্রগতির একটা রঙিন ছবি তুলে ধরেন। অপরদিকে বাস্তবে আমরা দেখছি, লক্ষ লক্ষ অসহায় মা কোলে অভুক্ত শিশু নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় খাদ্যের জন্য কাঁদছে। লক্ষ লক্ষ শিশু অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। দিনের শেষে সূর্যাস্তের পর যখন চারদিক কালো হয়ে আসে তখন সমাজের বুকে নেমে আসে আর এক ধরনের অন্ধকার। কোনও ভাবে সংসার চালানোর জন্য হাজার হাজার মা-বোন দেহ বিক্রির জন্য পথে এসে দাঁড়ায়। এমনকী ছয়-সাত বছরের শিশুকন্যাদেরও দেহ ব্যবসায় নামানো হচ্ছে। নারী ও শিশু পাচার উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

ব্যাপক হারে ভুয়ো বিবাহের ঘটনা ঘটছে, তথাকথিত স্বামীরা বিয়ের নামে ছলনা করে কয়েক দিন লালসা চরিতার্থের জন্য স্ত্রীকে রাখে, তারপর পতিতালয়ে তাদের বিক্রি করে দেয়। বর্তমানে আমাদের দেশে এটা একটা মস্তবড় লাভজনক

ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বহুক্ষেত্রেই বিবাহের রাতের ‘ফুলসজ্জা’ কন্টকসজ্জায় পরিণত হচ্ছে। স্বামীকে মদ্যপ ও লম্পট দেখে আঘাত পেয়ে স্ত্রী হয় পাগল হচ্ছে, না হয় আত্মহত্যা করছে। পণ-জনিত কারণে হত্যার ঘটনা, অনার কিলিং, গর্ভাবস্থায় লিঙ্গ নির্ধারণ, কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো ঘটনা ব্যাপকহারে বাড়ছে। ইভটিজিং, কিডন্যাপিং, রেপ, গ্যাং রেপের মতো ঘটনাও সমাজে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও শাসকরা দাবি করে চলেছে — দেশ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। কিন্তু এগোচ্ছে কোন্ দিকে? বলা হয় কোনও একটা দেশে মহিলাদের কী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, সেই মানদণ্ডে বোঝা যায় ঐ দেশ সভ্য কি না। এটা যদি সভ্যতা বিচারের মাপকাঠি হয় তবে আমাদের দেশকে আদৌ সভ্য দেশ বলা চলে কি? একে যদি সভ্যতা বলি তবে বর্বরতা কাকে বলে? এমনকী বর্বর যুগেও ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ২ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ৭০ বছরের বৃদ্ধার উপর ধর্ষণ চালানোর মতো জঘন্য জিনিস ছিল না। আমাদের দেশে এখন এই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতিই চলছে।

নারীর আর্তনাদ আজ মন্দিরে-মসজিদে আলোড়ন তোলেনা

যখন এই ধরনের অপরাধ ও হিংসাত্মক ঘটনা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, নির্যাতিতা মহিলাদের কান্না ও আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে, তখন মন্দির, মসজিদ ও গির্জায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রার্থনা, আরাধনা, নমাজ ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত যথারীতি চলছে। পুরোহিত, মৌলবী ও পাদ্রিরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন। কিন্তু নির্যাতিতা মহিলাদের চোখের জল ও কান্নার রোল ঐসব ‘পবিত্র প্রতিষ্ঠানে’র চার দেওয়াল ভেদ করে ভেতরে পৌঁছায় না। নিষ্পেষিত ও ক্লিষ্ট মহিলারা আর্ত ক্রন্দনে ‘যমরাজে’র কাছে মৃত্যু কামনা করেন জীবন থেকে পরিত্রাণ পেতে। অসহায় নারী সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য গেলে ঐ সব পুরোহিত, মৌলবী ও পাদ্রিরা ধর্মীয় বাণী শোনানোর সাথে সাথে লাঞ্ছিত-অপমানিত নারীদের কোনও রকম ক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রকাশ করা থেকে নিরস্ত করেন, সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে নিজের ভাগ্য বা কপাল বলে মেনে নিতে বলেন, যাবতীয় দুঃখকে পরম করুণাময়ের দয়া হিসাবে গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। নির্যাতিতাদের বলা হয় যেহেতু তারা পূর্বজন্মে পাপ করেছে সেইজন্যে তারা এ জন্মে শাস্তি ভোগ করছে। সুতরাং শান্ত মনে, নিঃশব্দে, নিঃশর্তভাবে সব কিছু মেনে নেওয়া উচিত। একমাত্র সেই পথেই নির্যাতিতারা ঈশ্বরের বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করে পরজন্মে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করবেন। আপনারা কি জানেন মহিলাদের সম্পর্কে ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি কী? হিন্দু ধর্মের প্রচারক যে শংকরাচার্যকে ‘ভগবান’ বলে অভিহিত করা হয়েছে, তিনি কিন্তু ‘নারী নরকের দ্বার’ এই কথা বলতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। খ্রিস্টধর্মে বর্ণিত আদম-ইভের কাহিনিতেও বলা হয়েছে, নারী ইভ পুরুষ আদমকে বিপথগামী করে পৃথিবীতে পাপ এনেছে। অন্যান্য ধর্মেও একই অভিমত ব্যক্ত হতে দেখা যায়। এই হচ্ছে মহিলাদের সম্পর্কে ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি।

অন্য দিকে পার্লামেন্টারি প্রতিষ্ঠান ও সংবিধান বিচার করলে কী পাই? বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমর্থকরা দাবি করে থাকেন যে, পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত আছে। তাঁরা এ কথাও বলেন যে এখানে বিচারব্যবস্থায় সকলেই ন্যায় বিচার পান, মহিলারাও ন্যায় বিচার পেয়ে থাকেন। তাঁরা এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে, দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে পুলিশ-মিলিটারি আছে, তারা মহিলাদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি? দেখতে পাচ্ছি সব কিছুই মিথ্যা, প্রতারণা, ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। এসব বুর্জোয়া নেতারা সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতারক। তারা সব সময়ই জনগণকে ঠকানোর জন্য নানা মিথ্যা কথা বলে। বাস্তব হল, দানবীয় একচেটিয়া পুঁজি, বহুজাতিক সংস্থা ও কর্পোরেট সেক্টরের নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর শাসনের পেষণে মহিলারা গোলাম হয়ে পিষ্ট হচ্ছে। এমনকী পুঁজিবাদের প্রথম যুগে যখন বুর্জোয়ারা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করছিল, তখনও মহিলাদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈষম্যমূলক। বলা হয়েছিল, বুর্জোয়া গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণেরই। কিন্তু তাদের এই জনগণের ক্যাটিগরির মধ্যে মহিলাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। মহিলাদের ভোটাধিকারও দেওয়া হয়নি। এমনকী তারা শিক্ষার অধিকারও পায়নি। পশ্চিমী দেশগুলিতেও মেয়েদের শিক্ষার অধিকার পাওয়ার জন্য, ভোটাধিকারের জন্য এবং নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারের জন্য কয়েক যুগ ধরে লড়তে হয়েছে। কারণ সামন্ততন্ত্রের অবসানের পর পুঁজিবাদ আর এক ধরনের শোষণমূলক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। বুর্জোয়া নবজাগরণ ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রবক্তারা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে পারেননি।

কখন ও কেন সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হল

এটা সত্য যে নবজাগরণের যুগে বুর্জোয়া পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকরাই আবিষ্কার করেছিলেন প্রাথমিক মানবসমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। যে সব বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা মানব সমাজের বিকাশকে খুঁটিয়ে বুঝতে চেয়েছেন, তাঁরাই অখণ্ডনীয় তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন মানবসমাজ প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক ছিল। কিন্তু

প্রথম সমাজ কেন মাতৃতান্ত্রিক ছিল, কেনই বা তা পরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হল তার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেননি। কারণ এটা তাঁদের জানা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মহান মার্কস-এঙ্গেলসের আগে পর্যন্ত এর কোনও সঠিক ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। মার্কস এবং এঙ্গেলস সেইসময়ে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের বিশেষ শাখার বিশেষ নিয়মগুলিকে সমন্বিত, সংযুক্ত এবং সাধারণীকৃত করে ইতিহাসে প্রথম একটি বৈজ্ঞানিক দর্শন গড়ে তুললেন এবং তার দ্বারা আবিষ্কার করলেন যে, প্রকৃতির মতো সমাজের পরিবর্তনও কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগ করে দেখালেন যেকোনও সমাজের ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদনব্যবস্থা, যা গড়ে ওঠে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ে। একে ভিত্তি করেই উপরিকাঠামো অবস্থান করে। দর্শন, আদর্শ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, পারিবারিক জীবন, আইন-কানুন, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নিয়েই উপরিকাঠামো। একটা বিশেষ সময় একটা বিশেষ উপরিকাঠামো একটা বিশেষ ভিত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে — এবং সেই উপরিকাঠামো সেই বিশেষ ভিত্তির পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। একটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কর্তৃত্বকারী শাসক শ্রেণি উৎপাদন যন্ত্রের মতো উপরিকাঠামোকেও কন্ট্রোল করে। ধর্মগুরুরা বলেন, নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য, নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য ঈশ্বরেরই বিধান। তাই এই পার্থক্য শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। এঁদের মতে পুরুষের সেবার জন্যই বিধাতা নারীকে সৃষ্টি করেছেন। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরাও অন্যভাবে বললেন যে, সমাজে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, নারী-পুরুষের মধ্যেও তেমন পার্থক্য আছে। এই বিভাজন চিরন্তন। অন্য দিকে মার্কসবাদ দেখিয়েছে, জগতে ও মানব সমাজে কোনও কিছুই শাশ্বত নয়। সব কিছুই পরিবর্তনশীল। একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ ঘটনা (ফেনোমেনা) আসে, আবার পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নতুনকে স্থান দিয়ে সে চলে যায়। এটা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আমি এখন নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য এবং সমাজে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব কীভাবে এল, এ প্রশ্নে মহান এঙ্গেলস কী বলেছেন তা পড়ে শোনাচ্ছি— **“১৮৪৬ সালে মার্কস ও আমার একটি লেখার অপ্রকাশিত পুরনো পাণ্ডুলিপিতে আমি পেলাম, নারী-পুরুষের শ্রমের প্রথম বিভাজন দেখা গেল সন্তান প্রসবকে কেন্দ্র করে। আজ আমি এর সাথে যুক্ত করতে পারি, ইতিহাসে যখন প্রথম শ্রেণি বিভাগ এবং বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, একইসাথে পুরুষ ও নারীর এক বিবাহ প্রথা বা একগামিতা (মনোগ্যামি)-কে ভিত্তি করে নারী-পুরুষেরও বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তার সাথেই প্রথম পুরুষের দ্বারা নারীর প্রতি অত্যাচার শুরু হয়। একগামিতা ইতিহাসে একটা অগ্রগতিকে সূচিত করেছিল, তা আবার দাসত্ব ও ব্যক্তি সম্পত্তিরও উদ্ভব ঘটিয়েছিল, সেই অধ্যায় আজও চলছে।”**[১] এখানে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিবিভাগ বা দাসপ্রথা আসার পর সমাজে পিতৃতন্ত্র কীভাবে মাতৃতন্ত্রের স্থান অধিকার করল। তিনি দেখিয়েছেন, যতদিন শ্রেণি বিভাজন থাকবে, ধনী-দরিদ্র থাকবে, শোষক-শোষিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাও কায়েম থাকবে। মহান কমরেড লেনিনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মহিলাদের পারিবারিক দাসত্বের শৃঙ্খলিত জীবনের উল্লেখ করে মুক্তির প্রশ্নে বলেছেন, “সমস্ত সভ্য দেশে, এমনকী সবথেকে অগ্রসর দেশগুলিতেও মেয়েদের অবস্থান থেকে পারিবারিক দাসত্বই প্রতিপন্ন হয়। শুধু কোনও একটি পুঁজিবাদী দেশেই নয়, এমনকী সবচেয়ে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রেও কি মহিলারা সার্বিকভাবে সমানাধিকার ভোগ করে? আমরা বলি শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি শ্রমজীবীদেরই অর্জন করতে হবে। একইভাবে শ্রমজীবী মহিলাদের মুক্তিও তাদের নিজেদেরই অর্জন করতে হবে।”[২] মহান স্ট্যালিনও দেখিয়েছেন শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে মহিলারা কি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি বলছেন, “মানবজাতির ইতিহাসে শোষিত মানুষের কোনও বড় আন্দোলনই শোষিত শ্রমজীবী মহিলাদের অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব হয়নি।”[৩] কমরেডস, মানব সভ্যতার ইতিহাসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই প্রথম মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছে কী করে স্থায়ী সম্পত্তির আবিষ্কার এবং উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানাকে ভিত্তি করে সমাজশ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এল। যখন উৎপাদন যন্ত্র ব্যক্তিমালিকানার শ্রেণি হল এবং দাস ও দাসপ্রভু ব্যবস্থার উদ্ভব হল, তখন থেকেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শুরু হল। মার্কসবাদ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে যখন শ্রেণি শোষণ ও শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটবে, তখনই কেবল পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটবে।

বিদ্যাসাগরের চিন্তার সাথে বিবেকানন্দ, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মৌলিক পার্থক্য ছিল

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের পরিস্থিতির বিচার করতে হবে। আপনারা সকলেই জানেন, রাজা রামমোহন রায়ই ভারতবর্ষে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অতি-প্রাকৃত এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। তিনি সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম এবং বেদান্তে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু

নারীদের প্রতি আচরণে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল সংস্কার আনতে পেরেছিলেন। ধর্মীয় বিধানের দোহাই দিয়ে সতীদাহের নামে মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করার জন্য রামমোহন কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। এরপর আমরা পাই আমাদের দেশের প্রথম ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগরের মতো মহান মানুষকে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে বেদ, গীতা, বেদান্তের মতো ধর্মশাস্ত্রকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, এ সবই হল মিথ্যা। এ সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা ও বস্তুবাদী চিন্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী ও বস্তুবাদী। তিনি বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্তন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করতে ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা ও নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমস্ত সমাজের তীব্র প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি সেদিন কী গভীর বেদনার সাথে বলেছিলেন, “তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলে স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।” ... “যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সৎ-অসৎ বিবেচনা নাই কেবল লৌকিকতা রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।”[৪] তিনি আরও একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলেছিলেন। যদিও বিদ্যাসাগরের মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ছিল না, ফলে সমাজের শ্রেণি বিভক্তি তিনি জানতেন না। তা সত্ত্বেও তাঁর মনে এই চিন্তা ধাক্কা দিয়েছিল যে, “মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় দুর্বল এবং সমাজের ত্রুটিপূর্ণ নিয়ম পালনের জন্যই তারা পুরুষ জাতির অধীন।” প্রথম যুগে যে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় দুর্বল ছিল না এটা তাঁর জানা ছিল না। দীর্ঘদিন শৃঙ্খলিত থেকে মেয়েদের যে এই দশা হয়েছে তা তিনি জানতেন না, তাই বাস্তবে মেয়েদের দুর্বল দেখে একথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরের উক্তি অসাধারণ দৃষ্টির পরিচায়ক। কারণ তিনি ধরতে পেরেছিলেন, ‘সমাজের ত্রুটিপূর্ণ নিয়ম পালনের জন্যই তারা পুরুষ জাতির অধীন’। সেদিন কেন আজও কয়জন এভাবে ভাবতে পেরেছে! একমাত্র মার্কসবাদীরা ব্যতিক্রম।

কিন্তু সেই যুগের আর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব বিবেকানন্দের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। একদিকে বিবেকানন্দ সদ্য জাগ্রত জাতীয়তাবাদের ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন, অপরদিকে একই সাথে বিদ্যাসাগর বর্জিত বেদান্তের চিন্তাকেও পুনরুজ্জীবিত করলেন। এর দ্বারা তিনি বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে গড়ে ওঠা সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগতিকে কার্যত বাধাগ্রস্ত করলেন। যদিও তিনি বড় মানুষ ছিলেন। কিছু নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে তিনি জরাজীর্ণ, পরিত্যাজ্য বেদান্তকে সত্যানুসন্ধানের পথ হিসাবে আঁকড়ে ধরে তাঁর অজ্ঞাতসারেই এই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিলেন, যেটা আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে আলোচনার চেষ্টা করেছি। এখানে পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

নারীদের আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিবেকানন্দর বক্তব্য শুনুন। শিক্ষার প্রশ্নে আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন, “ভারতীয় নারীদের সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গড়ে ওঠা উচিত। সীতা হচ্ছে অতুলনীয়া। সীতা ভারতীয় নারীর যথার্থ রূপ। আদর্শ নারী বলতে যা বোঝায় সীতা হচ্ছে তারই প্রতীক। সীতার জীবনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারীর যথার্থ আদর্শ গড়ে উঠেছে, মহীয়সী সীতা সবসময় সেভাবেই থাকবেন, সীতা হচ্ছেন পবিত্রতার মধ্যে পবিত্রতম। ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক...। আমাদের দেশের নারীদের আধুনিক করার যে কোনও চেষ্টা যদি সীতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় তৎক্ষণাৎই তা হবে চরম ব্যর্থতা, যা আমরা প্রতিদিন লক্ষ করছি”[৬]। এই চিন্তা কি মধ্যযুগীয় ধর্মীয় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নয়? এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট জাতীয় নেতা গান্ধীজী কী বলেছেন শুনুন। তিনি বলছেন, “নারী এবং পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। বহির্জগতের কাজের ক্ষেত্রে পুরুষই প্রধান এবং সেই কারণে এ বিষয়ে তার অধিকতর জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক। গার্হস্থ্য জীবন সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের কর্মক্ষেত্র, সেই কারণে গার্হস্থ্য জীবনে সন্তানের লালনপালন ও শিক্ষাদানের প্রয়োজনে মেয়েদের অধিকতর জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্যের উপলব্ধির ভিত্তিতে যদি শিক্ষাদান না করা হয় তাহলে নারী ও পুরুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে না...। সীতা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তীর জীবন থেকে আজও মেয়েরা বীরাঙ্গনা সুলভ আচরণের প্রেরণা ও পথনির্দেশ পেতে পারে।”[৭] ফলে দেখা যাচ্ছে গান্ধীজিও বিবেকানন্দের সাথে সম্পূর্ণ একমত। এখন আমি আর একজন গুরুত্বপূর্ণ মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে শোনাই। মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল — “মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান। এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে,

কিন্তু মেয়েদের কর্ম যেখানে সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইতেছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে, দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। ...

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া মেয়েদের স্বভাব, দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে — এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। ...

মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। ...”[৮] দেখুন,উদারনৈতিক, লিব্যারাল ডেমোক্র্যাট হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পক্ষেই মেয়েদের অনুগত থাকার জন্য যুক্তি দিয়েছেন।

ভারতের নবজাগরণে পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি ধারা ছিল

তা হলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বিদ্যাসাগর নারীদের সম্পর্কে যা বিশ্বাস করতেন, তার বিপরীত চিন্তাই বিবেকানন্দ, গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মানবতাবাদী বিপ্লবী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের চিন্তাকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ও তাঁর ভাবনাকে আরও বিকশিত করেছেন। যেখানে বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যে ভাববাদ, অধ্যাত্মবাদ, ধর্ম ভিত্তিক ঐতিহ্যবাদী বিশ্বাস কাজ করেছে, সেখানে বিদ্যাসাগর ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুবাদী মনোভাব কাজ করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণকে ঘিরে মতভেদ যখন দেখা দিয়েছিল, রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যবাদীরা মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন, তখন আপসহীন মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র মেয়েদের অংশগ্রহণকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলেন। দেশসেবা প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, “রাষ্ট্রীয় সাধনাতে নারীকেও নামতে হবে— দেশের স্বাধীনতার জন্য নারী-পুরুষের সম্মিলিত সাধনা চাই, তা নইলে কিছু হবে না। আমি জানি ছেলেরা এবং মেয়েরা যদি একসঙ্গে কাজে নামে, তা হলে দেশের লোক নানা রকম কুৎসা রটাবেই— তা রটাক। নিন্দুক তার কাজ করবেই, কিন্তু তাই বলে কি আমরা কাজ বন্ধ রাখব? দেশের জন্য যে সুনামের প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করতে পারবে না, তার আবার ত্যাগ কোথায়?”[৯]

মহিলারা যাতে সনাতন ধ্যানধারণার শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মনকে মুক্ত করে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য শরৎচন্দ্র মূল্যবান শিক্ষা তুলে ধরেছিলেন। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, বিবাহই জীবনের মূল লক্ষ্য, তা না হলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ধারণাকে খন্ডন করে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘শেষ প্রশ্ন’তে এ সম্পর্কে তিনি আলোচনায় লিখেছেন, “সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা — তার বেশী নয়”[১০]। অর্থাৎ পুরুষের মতো নারীর জীবনেও অনেক ঘটনা আসে , বিবাহ শুধু তার অন্যতম। এটাই মূল নয়। তিনি আরও বলেছেন ...“যারা ঘোষণা করেছিল, পুত্রের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন, তারা মেয়েদের অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল এবং সেই অসত্যের পরে ভিত পুঁতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হল না।”...[১১]

‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’ অর্থাৎ পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন — এই চিন্তার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ করেছেন তীব্র ভাষায়। তিনি বলেছেন, ... “চাটুবাক্যের নানা অলংকার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বেই চরম সার্থকতা, সমস্ত নারীজাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল।” ...[১২] আমার যতদূর জানা আছে, ইউরোপের নবজাগরণের যুগের সাহিত্যেও শরৎচন্দ্রের মতো এত অগ্রসর চিন্তা কারও লেখাতেই দেখতে পাওয়া যায় না। আপনারা জানেন, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ শরৎচন্দ্রকে নবজাগরণের একজন আপসহীন বলিষ্ঠ মানবতাবাদী চিন্তানায়ক ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে বলেছেন, শরৎচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চিন্তার খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সুতরাং আপনারা দেখতে পেলেন যে ভারতীয় নবজাগরণের দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারা ছিল। একটি ধারার সমর্থক ছিলেন বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, অপর ধারাটি তুলে ধরেছিলেন বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র। প্রথম ধারাটি ছিল শক্তিশালী, কারণ ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, যারা সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সামন্ততন্ত্র ও অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে আপস করে এগিয়েছিল। এজন্যই তারা বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে সমর্থন করে সামনে নিয়ে এল। তখন আমাদের দেশে একটা যথার্থ মার্কসবাদী দল না থাকায় কোনও সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন ছিল না, মেকি মার্কসবাদী এবং তথাকথিত কমিউনিস্টরা বিদ্যাসাগর এবং শরৎচন্দ্রের চিন্তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেনি। বরং উল্টোটাই করেছে। ফলে গ্রামে নিরক্ষর, শিক্ষাবঞ্চিত, জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব ছিল এবং

শহরের শিক্ষিত জনগণের মানসিকতাও মূলত গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের শিক্ষা ও চিন্তার ছাঁচেই গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও নারীর প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পিছনে ঐ চিন্তাই কাজ করেছে।

এ দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষই নারীমুক্তি আন্দোলনের পথ নির্দেশ দিয়েছেন

এমনকী আজও আমরা এটা প্রত্যক্ষ করছি। আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই, তখন যদি কোনও সঠিক মার্কসবাদী নেতৃত্বের বিকাশ এ দেশে ঘটত তাহলে পরিস্থিতি অন্য রকম হত। সেই নেতৃত্ব পারতেন বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্রের ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদী চিন্তাচেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে এবং সেই চিন্তার ধারাবাহিকতাতে ও তার সাথে ছেদ ঘটিয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম দিতে। পরবর্তীকালে কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের চোখের জল ও ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়েই জন্ম হল সেই নেতৃত্বের। তিনি হচ্ছেন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। কমরেড শিবদাস ঘোষ এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করলেন। আমাদের দেশ ও বিশ্বের বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক এবং সুনির্দিষ্টভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগ করলেন এবং সেই প্রক্রিয়ায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আরও উন্নত, সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করলেন এবং নতুন উপলব্ধির স্তরে নিয়ে এলেন যাকে আমরা বলি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। তিনিই সর্বহারা সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সঠিক ধারণা উপস্থিত করেছেন। মার্কসীয় চিন্তার ভিত্তিতেই তিনি কেন ও কিভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হল সেটা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “সমাজ একসময় ছিল মাতৃতান্ত্রিক। চাষাবাদ চালু হওয়ার পর যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম হল, তখনই সমাজ হয়ে পড়ল পিতৃতান্ত্রিক। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার পর পুরুষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল এবং শ্রমবিভাজন শুরু হল এবং এরপর থেকেই শুরু হল নারীদের উপর দমনপীড়ন। এই যুগেই নারী ও পুরুষের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে এই লড়াই চলতে থাকে। সেই লড়াইটা ছিল নারীজাতিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা ও তার বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সেই নারীজাতিই এই অধীনতা মেনে নেয়।”...[১৩] নারীমুক্তি অর্জন কোন্ পথে হবে সেটা নির্ধারণ করে তিনি বলেন, “নারী ও পুরুষ উভয়ে মিলে এই সমাজটাকে গড়ে তুলেছে, ফলে সমাজের অগ্রগতি, বিকাশ এবং সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে যেমন পুরুষের ভূমিকা আছে নারীদেরও একইরকম ভূমিকা রয়েছে। বিপ্লব অর্থাৎ পুঁজিবাদী দমন পীড়ন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি অর্জনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারী ও পুরুষের মুক্তি। নারী-পুরুষ উভয়কেই এই সংগ্রামে সমানভাবে অংশ নিতে হবে। এই সংগ্রামে সমাজের সর্বস্তরের নারীদের — মধ্যবিত্ত, কৃষক রমণী, শ্রমজীবী রমণী সকলকেই অংশ নিতে হবে। তোমরা তোমাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই সংগ্রামে অংশ নাও। এটাই মুক্তির একমাত্র সঠিক রাস্তা। এ ছাড়া মুক্তির অন্য কোনও রাস্তা নেই।”...[১৪] কমরেড শিবদাস ঘোষ এই পথনির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। আপনাদের নেতৃত্ব আমার কাছে পথনির্দেশ চেয়েছেন। আমি কি কোনও পথনির্দেশ দিতে পারি! আমাদের মহান শিক্ষকের পথনির্দেশকে আমি হয়তো কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি মাত্র। তারই চেষ্টা করছি। আমাদের দেশে তিনিই প্রথম নারীমুক্তি আন্দোলনের পথনির্দেশ দিয়েছেন। আবার সাথে সাথে তিনি নারীদের সতর্ক করেও বলেছেন, “দীর্ঘকাল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলতে চলতে নারীদের এরকমই মানসিক ধাঁচা তৈরি হয়ে গিয়েছে যে তারা শুধু ওই সমস্ত নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলতে অভ্যস্তই হয়ে ওঠেনি, সমস্ত কুসংস্কারগুলোকে জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। বর্তমানে নারীসমাজ নিজেরাই এইসব কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়েছে। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে মেয়েরা নিজেরাই নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলছেন।”...[১৫]

শৈশব থেকেই মেয়েদের দাসত্বের শিক্ষা শুরু হয়

কেন এরকম ঘটছে? কারণ আমাদের দেশে নবজাগরণের মূল ধারা ধর্মের সাথে আপস করেছে। সমস্ত ধর্মীয় কাহিনী, পৌরাণিক গল্প এমনভাবে লেখা হয়েছে যে নারী যেন জন্মেছে শুধুমাত্র পুরুষদের দাসীর মতো সেবা করবার জন্য এবং এটাই তাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। হাজার হাজার বছর ধরে, সেই দাসসমাজ থেকে শুরু করে সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদ সব সমাজেই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীদের উপর অত্যাচার ও দমনপীড়ন করেছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত অত্যাচার স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে। মা-ঠাকুমারা তাদের মেয়েদের, নাতনিদের একইভাবে শিক্ষা দেন, পরবর্তী প্রজন্মও তাদের এইভাবে শিক্ষা দেয়। এই ধরনের প্রশিক্ষণ একটি মেয়ের শৈশব থেকেই শুরু হয়। একটি মেয়েকে শিশু বয়স থেকেই শেখানো হয় আর যাই হোক না কেন, তুমি একজন মেয়ে। তোমার বিয়ে হবে এবং তোমার জীবনে একজন স্বামীর আবির্ভাব ঘটবে। তাই তুমি ‘এভাবে’ বা ‘সেভাবে’ চলতে পার

না। নিজের ইচ্ছে মতো কথা বলতে পারবে না বা নিজের ইচ্ছে মতো আচরণ করতে পারবে না। কারণ পরের ইচ্ছেই তোমার ইচ্ছে। এমনকী আনন্দে সশব্দে হাসতেও তুমি পারবে না। ওটা হবে অসভ্যতা। তাই তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে নিজেকে স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী অনুগত সেবাদাসী হিসাবে গড়ে তুলতে পারা। তোমাকে অবশ্যই মা হতে হবে এবং সেই মা হতে হবে পুত্রসন্তানের, কন্যাসন্তানের নয়। পুত্রসন্তান স্বাগত, কন্যাসন্তান নয়। এই সমাজে একটি মেয়ে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যায় যে তার যদি বিয়ে না হয় তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অন্য দিকে তার পক্ষে অবিবাহিত থাকাটা এই কারণে আরও কঠিন যে অবিবাহিত থাকলেই তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এইসব প্রশ্নে তাকে জর্জরিত করবে যে, তোমাকে কে দেখবে? বিশেষ করে যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে তখন তোমার কী হবে? পুত্রসন্তানের মা না হলে তাকে নানাভাবে দোষারোপ করা হয়, অপমান, অত্যাচার নির্যাতন করা হয়, এমনকী তাকে হত্যাও করা হয়। সন্তান না হওয়ার জন্য সবসময়ই স্ত্রীকে অপরাধী করা হয়। কখনও এই সমস্ত অত্যাচারিতা মহিলারা পাগল হয়ে যান। এমনকী যদি দেখেন তাঁর বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ অথবা তিনি মা হতে অপারগ, অনেক সময় তাঁরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। একজন মহিলা তিনি যদি শিক্ষিকা, ডাক্তার বা একজন বিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদ কিংবা একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে সফলও হন, সেই সফলতা তাঁর কাছে বা অন্যদের কাছে অর্থহীন বলে মনে হবে যতক্ষণ না তিনি একজনের স্ত্রী বা মা হতে পারছেন। মা না হলে নারী নিজেই মনে করে তার নারীত্ব অপূর্ণ। এই মানসিকতা ও চিন্তা-ভাবনাই সুদুর অতীত থেকে মেয়েদের মধ্যে বিরাজ করছে। হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েদের রক্তে মাংসে হাড়ে মজ্জায় এই চিন্তা একেবারে মিশে গিয়েছে। এই ধরনের প্রথা বা অভ্যাসই তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এই অনুভূতিগুলোই তাদের যেন সহজাত হয়ে গিয়েছে। এমন সঙ্গীত, নাটক, লোককাহিনী প্রচুর আছে যা মেয়েদের এই ধরনের চিন্তাভাবনার, নারীত্বের চিরাচরিত চিন্তাভাবনারই জয়গান করে মেয়েদের এই ধরনের মানসিকতার মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চায়। বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই ভাবগত বন্ধন থেকে প্রথম মেয়েদের মুক্ত হতে হবে।

প্রয়োজন গভীর জ্ঞান ও অধ্যবসায়

তাই এই বন্ধন বা বেড়ি ভাঙার জন্য খুব গুরুত্ব দিয়ে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত সংগ্রাম চালাতে হবে। শুধুমাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করে, পুস্তিকা প্রকাশ করে

বা মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিয়ে এই দাসসুলভ মানসিকতা থেকে নারীকে মুক্ত করা যাবে না। নারীমুক্তি আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অধ্যবসায়, অসীম ধৈর্য এবং কর্মকুশলতা। ভারত একটি বিশাল দেশ। কোটি কোটি মেয়েদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব আপনাদের। অন্যদের শিক্ষা দিতে গেলে আগে নিজেদের শিক্ষিত হতে হবে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন না যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এ যুগের সর্বাপেক্ষা উন্নত উপলব্ধি — কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ পুরুষ সমাজকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে স্ত্রীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে তারাও মুক্ত হতে পারবে না। যে অপরকে শৃঙ্খলিত করেছে, অন্যদিকে সে নিজেও তো শৃঙ্খলিত। একজন পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে মুক্ত না হচ্ছে, সে কখনও কমিউনিস্ট হতে পারে না। এটাও এক কঠিন সংগ্রাম। বিয়ের পর একজন পুরুষ ভাবতে থাকে স্ত্রী তার সম্পত্তি। স্ত্রীও ভাবতে থাকে সে যেহেতু তার দেহ এবং অন্য সবকিছুই স্বামীকে সমর্পণ করেছে, ফলে সে তার স্বামীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। সমাজে এরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করে যে মহিলারা ঘরের মধ্যে থাকবে — শোবার ঘর, রান্নাঘরের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখবে এবং সন্তান প্রতিপালন করবে। ক্রীতদাসীর মতোই হবে তার জীবনযাত্রা। কিছুদিন আগে দিল্লিতে ২৩ বছরের তরুণীকে ধর্ষণের যে ঘটনা ঘটল, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবৎ বলেছেন, ‘মেয়েরা লক্ষণরেখা অতিক্রম করতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে’। এই লক্ষণরেখা বলতে তিনি চিরাচরিত চিন্তাভাবনা ও বিধিনিষেধের কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, গ্রামের মহিলাদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হল, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধিবন্ধন লঙঘন করলেই মেয়েরা ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, গণধর্ষণের শিকার হতে পারে, খুনও হতে পারে। বিষয়টা যেন এমন যে, যেসব মহিলারা ঘরে থাকেন বা গ্রামে থাকেন তাঁরা শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, গণধর্ষণের শিকার হন না বা পারিবারিক হিংসার শিকার হন না। বাস্তব কি তাই বলে? আর. এস. এস. প্রধান এই যুক্তিও করেছেন, রাবণেরা অর্থাৎ ধর্ষকেরা লক্ষ্মণরেখার বাইরে থাকবেই, মেয়েরা ঘরের বাইরে এসে লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করবে না। দিল্লীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশে কি আলোড়ন ঘটে গেল, কত নারীর চোখের জল ঝরছে! এ অবস্থায় কত নিষ্ঠুর ও অমানবিক হলে বি. জে. পি.-র গার্জিয়ান আর. এস. এস. এর প্রধান এই ধরনের উক্তি করতে পারেন! এই হচ্ছে ওদের হিন্দুত্ব, ওদের ধর্ম। একবারও এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ করলেন না, রাস্তায়

নামলেন না।

এই মানসিকতা পরিবর্তন করতে হলে এবং কায়েমি স্বার্থসম্বলিত এই সমস্ত কুৎসিত চিন্তাকে একেবারে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে তীব্র কষ্টসাধ্য আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা অপরিহার্য। এজন্যই মেয়েদের মধ্য থেকে আপনাদের প্রয়োজন উন্নতমানের তত্ত্ববিদ, দক্ষ প্রচারক ও যোগ্য সংগঠক। আদর্শ ও চিন্তাভাবনা সাংস্কৃতিক মাধ্যমে প্রচারের জন্য নাট্য ও সংগীতগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। গ্রামের মহিলাদের তাদের ভাষাতেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে আপনাদের । সাধারণ মেয়েদের মধ্যে যে ধর্মীয় চিন্তা আছে তা থেকে সহজে তাদের মুক্ত করা যাবে না। প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী, আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত লড়াই। যতদিন পর্যন্ত সমাজে শ্রেণিবিভাগ থাকবে, শোষক ও শোষিত, শাসক-শাসিত বিভাজন থাকবে, ততদিন ‘এই বিশ্বেরও একজন শাসক আছে’ এই চিন্তা বিরাজ করবে। যতদিন পর্যন্ত না মানবজাতি নিজেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারছে, ততদিন তাদের মধ্যে এই প্রবাদ থেকে যাবে, ‘ম্যান প্রপোজেস, গড ডিসপোজেস’। মানুষ যতদিন না সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস বা অগ্রগতি জানতে পারছে, প্রকৃতির সমস্ত রহস্য উদঘাটনের জন্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা আয়ত্ত করতে পারছে ততদিন পর্যন্ত তারা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করবে, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বা কার্যাবলীর পিছনে কারও অদৃশ্য হাত খুঁজবে এবং সমস্ত কিছুকেই সে ভাববে পূর্বনির্ধারিত। একইভাবে যতদিন তার বাস্তব জীবন দুর্বিষহ নরক-যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার কল্পনার জগতে সান্ত্বনা থাকবে মৃত্যুর পর এক স্বর্গীয় জীবন, যেখানে এইসব দুঃখ কষ্ট থাকবে না এবং অশেষ সুখ শান্তি বিরাজ করবে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই পারবে এই ধর্মীয় চিন্তা গড়ে ওঠার ভিত্তির অবসান ঘটাতে।

পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতেই নারী আন্দোলন

এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজই হল ধর্মীয় চিন্তা জন্ম দেওয়ার আঁতুড়ঘর। যদি সর্বহারা বিপ্লবী চিন্তায় পরিচালিত এবং আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত সংগ্রামের সাথে যুক্ত করে গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায় তবে হাজার হাজার মহিলা, অসংখ্য অসহায় মহিলাও তার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত হতে পারবেন। এই গণআন্দোলনই পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধশক্তি হিসাবে, অ্যান্টিথিসিস হিসাবে কাজ করবে। সুপারস্ট্রাকচার বা উপরিকাঠামোতে শোষক শ্রেণির কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য থাকলেও সচেতন শোষিত জণগণ উপরিকাঠামোতে ভাবগত সংগ্রাম চালাবে। মনে রাখবেন, পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবলুপ্তির কাজ শুরু হবে। যদিও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমান অধিকার পাবে, কিন্তু সমাজের উপরিকাঠামোতে, অর্থাৎ চিন্তায়-চেতনায়-সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতার ধ্বংসাবশেষ থাকবে। সেজন্য এই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ধ্বংসাবশেষ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সঠিক আর্দশগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের বিরামহীন সংগ্রাম চালানোর প্রক্রিয়ায় যত সমাজতন্ত্র এগিয়ে যাবে, উপরিকাঠামোতে পুরুষতান্ত্রিকতার অবশিষ্টাংশ তত দ্রুত দূরীভূত হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত যখন কমিউনিজমের স্তরে উপনীত হওয়া যাবে তখনই একমাত্র পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে। নারীবাদী (ফেমিনিস্ট) আন্দোলনের যাঁরা সমর্থক তাঁরাও নারী স্বাধীনতার কথা বলেন। তাঁরা বোঝেন না যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজও আকস্মিকভাবে বা কিছু পুরুষ চেয়েছে বলে আবির্ভূত হয়নি। উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের এক বিশেষ স্তরে এই সমাজ এসেছে। আমি আগেই বলেছি সমাজ যখন শ্রেণিবিভক্ত হয়েছে তখনই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়েছে, এবং যতদিন সমাজে শ্রেণিবিভাজন থাকবে ততদিন এই ব্যবস্থা চলবে। তাই শ্রেণিসংগ্রামকে এড়িয়ে গিয়ে, সমাজ বিকাশের এই অলংঘনীয় ধারাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে, কিংবা পুরুষদের মত সমান সমান সুযোগগুলো পাওয়ার দাবিতে বিতর্ক, সেমিনার সংগঠিত করে নারীমুক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। পুরুষজাতিকেও বুঝতে হবে নারীদের মুক্তি না হলে তাদের মুক্তিও অর্জিত হবে না।পুরুষ এবং নারীকে যুক্ত ভাবেই এই আন্দোলন করতে হবে এবং এই সংগ্রাম পরিচালিত হবে পুরুষদের বিরুদ্ধে নয়, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাই যখন নারীদের যথাযথ দাবির ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে, নারীমুক্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, সেই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য থাকবে পুঁজিবাদবিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করা।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও আলোচনা করতে চাই। বর্তমান সময়ে সমগ্র দুনিয়ায় এবং আমাদের দেশে পুঁজিবাদী সভ্যতার অন্তিমলগ্নে চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, রুচিহীনতা, সামাজিক-পারিবারিক দায়বদ্ধহীনতা, মনুষ্যত্ব বর্জিত ক্লেদাক্ত জীবনের ভোগ সর্বস্বতা সমগ্র মানব সম্পর্ককে গ্রাস করছে, নীতি-আদর্শ-বিবেকবর্জিত যথেচ্ছাচারের জীবনকেই স্বাধীনতা বলে গণ্য করানো হচ্ছে এবং এরই পরিণতিতে একদলকে বিবাহ বর্জিত ‘লিভ টুগেদার’, ‘হোমো সেক্সুয়াল’

লাইফকে লিগালাইজ করানো, নির্বিচারে হোটেলে রাত কাটানো — এই দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অতীতে সামন্তপ্রভুরা প্রাসাদের অন্তঃপুরে মহিষীদের আবদ্ধ রেখে বাইরে বাগানবাড়ীতে ‘রক্ষিতা’ ও নর্তকীদের নিয়ে ফূর্তি করতো। এখন পুঁজিবাদী ‘সভ্য মানুষেরা’ ঘরে স্ত্রীদের রেখে দেশ-বিদেশে দামী হোটেলে, রিসর্টে ‘গার্ল ফ্রেন্ড’ নিয়ে ব্যাভিচারী জীবনযাপন করছে। ‘স্বাধীনতা’র নামে একদল নারীও এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এটা অত্যন্ত ভয়ংকর সমস্যা। নারীবাদীদের একাংশও এদিকে ঝুঁকছে। এদের চিন্তার ধারা অনুসরণ করলে বন্য জন্তুরাই সবচেয়ে স্বাধীন, কারণ তাদের জগতে বিবেক-মনুষ্যত্ব-ন্যায়নীতি এসবের ‘শৃঙ্খল’ নেই। জন্তুরা সাবজুগেটেড টু ন্যাচারাল ল। মানুষ বরং উন্নত মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ন্যাচারাল ল’কে স্টাডি করে ক্রমাগত সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। ক্ষতিকারক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সভ্যতা এনেছে বিবেক, মনুষ্যত্ব, ন্যায়নীতিবোধ, সুস্থ, উন্নত, শালীন, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের প্রয়োজনে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে এগুলিরও কনটেন্ট ও ফর্ম-এর পরিবর্তন ঘটে। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্মকথা হচ্ছে, এক যুগের যে আদর্শ-ন্যায়-নীতিবোধ প্রগতিশীলতা হারিয়ে নূতন যুগের প্রয়োজনের মানদন্ডে অকার্যকরী ও ক্ষতিকারক হয়েছে, তার পরিবর্তে নূতন মূল্যবোধ ও আদর্শের জন্য লড়াই করার স্বাধীনতা। যার যেমন খেয়ালখুশি তেমন জীবনযাপন করব, রুচি-সংস্কৃতির তোয়াক্কা করব না, কোনওদিকে ভ্রুক্ষেপ করব না, এই জীবন সত্যিকারের মানুষের জীবন নয়, প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়। কিন্তু আশংকা ও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে পচাগলা পুঁজিবাদী সভ্যতা এদিকেই নিয়ে যাচ্ছে এবং শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের একাংশ এর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে নিচুতলাতেও এর বিষাক্ত প্রভাব পড়ছে। এই বিপজ্জনক আক্রমণের বিরুদ্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আপনাদের লড়াই চালাতে হবে।

প্রতিটি অংশের নারীদের বিশেষ সমস্যাকে বুঝতে হবে সংগঠকদের

পরবর্তী প্রশ্ন হল, এই সমস্ত অত্যাচারিত মহিলাদের কীভাবে আন্দোলনে সংগঠিত করা যাবে। সমাজে বিভিন্ন অংশের মহিলা আছেন। শহর ও শহরতলিতে শিক্ষিত মহিলা এবং গ্রামে-গঞ্জে ও বস্তিতে আছেন শিক্ষাবঞ্চিত মহিলারা। শহরে শিক্ষিত মহিলারা হয় পুরোপুরি সাংসারিক কাজে নিমজ্জিত থাকেন, নয়ত সংসারের কাজের সাথে সাথে তাঁদের অফিস বা বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানেও দায়িত্ব সমানভাবে সামলাতে হয়। দরিদ্র মহিলারা শ্রমিক হিসেবে চা-বাগানে, সূচী শিল্পে, পোশাক তৈরির কারখানায়, নির্মাণকার্যে, খনিতে, পরিচারিকা বৃত্তিতে এবং কৃষিক্ষেত্রে কাজ করেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সচ্ছল ও গরিব, মহিলা হিসেবে এঁরা সকলেই একই ধরনের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। আবার একই সাথে, প্রত্যেক অংশের মহিলাদের নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ সমস্যা রয়েছে। আমাদের নেতাদের, অর্থাৎ মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন, যাঁরা সংগঠক, তাঁদের খুব খুঁটিয়ে এই নির্দিষ্ট সমস্যাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ সমস্যাগুলিকে বিশেষভাবে সমাধান করতে হবে। শিক্ষিত কমরেডরা যাঁরা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন, তাঁরা যেন পেটিবুর্জোয়া মানসিকতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বস্তি ও গ্রামীণ মহিলাদের থেকে দূরে সরে না থাকেন। এই সম্পর্কিত আদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে এই সংগ্রামটাও তাঁকে ডিক্লাস্‌ড (শ্রেণিচ্যুত) হতে সাহায্য করবে। নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে গরিব বস্তিবাসী মহিলাদের সাথে মেলামেশা করুন। গৃহপরিচারিকাদের নিজের বোনের মতো ভালোবাসুন। এ ব্যাপারে মনের মধ্যে যদি কোনওরকম বাধা অনুভব করেন তবে সেই সমস্ত পেটিবুর্জোয়া মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেরিয়ে আসুন। মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যে একদিকে ধর্মীয় কুসংস্কার, অপরদিকে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, বিলাসবহুল জীবনের আকাঙ্ক্ষা, ভোগবাদ, অত্যাধুনিকতার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যখন এদের মধ্যে আপনারা কাজ করবেন নিজেদেরই অজান্তে এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাবেন যদি উচ্চ সংস্কৃতির এবং উন্নত রুচির সুর আপনার বাঁধা না থাকে। তারা মধ্যবিত্ত দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদ ও প্রতিষ্ঠিত (কেরিয়ারিজম) হওয়ার লড়াইতে ব্যস্ত থাকে, এগুলির বিরুদ্ধেও আপনাদের লড়তে হবে। আবার দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে জাতপাত, ধর্মীয় সংস্কারের প্রভাব বেশি। কিন্তু তারা লড়াইতে অনেক বেশি সাহসী। ডিগ্রির ছাপছোপ, পোষাকের পারিপাট্য যাই থাকুক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যে নৈতিকতার সংকট যত বাড়ছে, দেখা যায় তুলনায়, এ সব অশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত ছিন্ন মলিন পোষাক পরিহিত গরিব মহিলাদের মধ্যে নৈতিকতার কিছু আজও আছে। যেহেতু তারা ফ্যাক্টরিতে, খনিতে, চা বাগানে একসাথে কাজ করে — এদের একত্রিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ আই এম এস এস অবশ্যই কর্মীদের পাঠাবে এই শোষিত যন্ত্রণাগ্রস্ত মহিলাদের কাছে। মধ্যবিত্ত ঘর থেকে আসা মহিলা কর্মীদের ডিক্লাসড হওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা হিসেবে উপরোক্ত সংগ্রাম সাহায্য করবে। সকল নারীর মুক্তি সংগ্রামে এদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং সুশিক্ষিত করতে হবে। আমি পুনরায় বলছি,

কিছু সাধারণ সমস্যা সমস্ত মহিলাদের জীবনেই রয়েছে। কিন্তু ঐ সমস্যাগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা ও পার্থক্য রয়েছে, বিশেষ ধরনের ও বিশেষ সমস্যা রয়েছে। এ আই এম এস এস-কে গড়ে তোলার জন্য অসীম ধৈর্য ও সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে মার্কসীয় বিজ্ঞান প্রয়োগ করে, এইসব বিভিন্ন সমস্যার পার্থক্য ও বৈচিত্র্যকে আপনাদের বিচার করতে হবে। আমি সমস্ত উর্ধ্বতন নেতৃত্বকে বলছি, বয়সের দিক থেকে অনেকেই হয়ত বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু সবসময় মনের তারুণ্য বজায় রাখুন। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা যতটা আপনারা আয়ত্ত করবেন ততটাই আপনাদের মনের যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকবে। জুনিয়র কর্মীদের নিজেদের সন্তানের মতো দেখুন। রাগারাগি করে তাদের সাথে অত্যাচারী শাশুড়ির মতো ব্যবহার করবেন না। তাদের শিক্ষিত করুন, স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করুন। তারা হয়ত ভুল করবে। তাতে কী? ভুল আপনারাও করেন, আমরাও করি। তাই অধৈর্য হবেন না, রূঢ় ব্যবহার করবেন না। আপনার আচরণ হবে যত্নশীল মায়ের মতো, যিনি নিজে হয়ত স্কুলের গণ্ডি পার হননি, কিন্তু মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করতে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। আপনারা এভাবেই নতুন কর্মীদের যত্ন নেবেন। সাহায্য করুন যাতে তারা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপনাদের স্তর অতিক্রম করতে পারে। এটাই হবে আপনাদের সফলতা, ব্যর্থতা নয়। জুনিয়র কর্মীরা সিনিয়র কমরেডদের মায়ের মতো দেখবে। আরেকটা বিষয় বলছি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিই হচ্ছে ব্যক্তিগত লাভ, শোষণ, অপরকে কমপিটিশনে হারিয়ে নিজে বেশী লাভ করা। এর ফলে সমাজে এসেছে নিজেকে জাহির করা, অপরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, অন্যের ত্রুটি খোঁজা, অপরের প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষের আগুন। এসবই পুরুষদের মধ্যে আছে । আবার একই জিনিষ আছে মেয়েদের মধ্যেও। আর মেয়েদের জীবন সংকীর্ণ থাকার ফলে এই সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা আরও বেশী থাকে। আর পুরুষের প্রশংসা পাওয়ার কমপিটিশনেও একদল মেতে ওঠে। এটা তাদের বিকাশের গতি রুদ্ধ করে এবং আত্মমর্যাদা নষ্ট করে।

আজ এই সংগঠন অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু শুরুর দিকে সিনিয়র নেতৃত্বকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা সাহসের সাথে বহু কঠিন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেছেন। তাই শুধু তাঁদের বয়স ও অভিজ্ঞতাকেনয়, তাঁদের সংগ্রামকে শ্রদ্ধা করুন। তাঁদের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিন। নেতৃবৃন্দ প্রতিনিয়ত তাঁদের নিজেদের আদর্শগত চেতনার মান, উন্নত সংস্কৃতি, উচ্চতর সাংগঠনিক ক্ষমতা, কাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা — এগুলোর দ্বারা অবশ্যই জুনিয়র কর্মীদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আদায় করে নেবেন। জুনিয়র কমরেডদের সামনে তাঁরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করুন যাতে জুনিয়র কমরেডরা সহজেই তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, মতপার্থক্য ব্যক্ত করতে পারে এবং সমালোচনা রাখতে পারে নির্দ্বিধায়, সাবলীল এবং সহজভাবে। মতপার্থক্যের সমাধান যুক্তি দিয়েই করতে হবে, ধমক, বিরক্তি বা ধামাচাপা দিয়ে নয়। যৌথ কর্মপদ্ধতি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে যুক্ত করুন। নিজেদের মধ্যে সবসময়ই ইনফরমাল ও ফরমাল টক করুন। কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্দেশিত কনস্ট্যান্ট কমন এ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন এবং কনস্ট্যান্ট কমন এ্যাকটিভিটিস বাস্তবায়িত করার সংগ্রামে লিপ্ত হোন। নীচতা, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, ঈর্ষাপরায়ণতা, নিজেকে জাহির করা এবং যশ, পদ-এর লালসা ইত্যাদি বুর্জোয়া বদ অভ্যাস ও হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। কমরেডদের উৎসাহিত করুন নিয়মিতভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের বই, মার্কসীয় দর্শন, শরৎসাহিত্য এবং রেঁনেসার সময়ের লেখকদের বই এবং মহিলা বিপ্লবী সহ সমস্ত মহান বিপ্লবীদের জীবন ও সংগ্রাম চর্চা করার জন্য। নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করুন। প্রতিটি সাধারণ সদস্যকে কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কল্যাণমূলক কাজের সাথে যুক্ত করুন যাতে তারা প্রত্যেকে সক্রিয় হয়। শান্ত মাথায় ভাবুন সংগঠনে নতুন যে আসছে কোন কাজ সে সহজে ও খুশি মনে গ্রহণ করছে এবং সেই ভিত্তিতে তাকে কাজে নিয়োজিত করুন। তাদের শেখান কীভাবে অসুবিধাকে সুবিধায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে পর্যবসিত করতে হয়। যখন মহিলাদের সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম করছেন তখন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব এবং সমস্ত স্তরের শোষিত মানুষের সংগ্রামের প্রতি অবশ্যই আপনারা সংহতি জানাবেন।

আপনারা যারা এই সংগঠনের কর্মী, তাঁদেরও নানা জটিল সমস্যা আছে। আপনাদের মধ্যে আছেন, যারা দরিদ্র পরিবারের, অভাব-অনটনের মধ্যে সংসারের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয় , যে সমস্যা কিছুটা সম্পন্ন পরিবারের কর্মীদের ফেস করতে হয় না। এই দরিদ্র পরিবারের কর্মীদের সমস্যা অন্যদের বুঝতে হবে। অবশ্য এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও আছে কমরেড ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দরিদ্র ঘরের কর্মী নিষ্ঠায়, কর্তব্যপরায়ণতায় অন্যদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন কর্মী আছে যার বাড়ি, স্বামী গণআন্দোলনে যুক্ত, ফলে স্ত্রীরা বাড়ি থেকে উৎসাহ পায়, সাহায্য পায়। আবার কারও কারও বাড়ি-স্বামী প্রবল বিরোধী, অনেক অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে তাদের কাজ করতে হয়। আবার কারও স্বামী নিজে গণআন্দোলনে থাকেন, কিন্তু স্ত্রী এতটা নামুক বা

একদম নামুক চায় না। গণতান্ত্রিক ভাব দেখিয়ে বলেন, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যা করবে ঘর সংসার সব বজায় রেখে করবে। আবার এমনও ঘটে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সক্রিয় কর্মী। স্ত্রী নিজের দক্ষতায় স্বামীর থেকেও যোগ্যতায় এগিয়ে গেছে, এতে কোনও কোনও স্বামী গর্বিত হয়, আবার কোনও কোনও স্বামী মনঃক্ষুন্নও হয়, পারিবারিক অশান্তি হয়। এ ধরনের নানা সমস্যা কর্মীদের জীবনে আসে। আপনাদের সংগঠনের নেতাদের কর্তব্য হচ্ছে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে এই ধরনের বিশেষ কর্মীদের বিশেষ সমস্যায় বিশেষভাবে সাহায্য করা।

প্রকৃত ভালোবাসা দুর্বলতা নয়

মনে রাখবেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন — ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা এ সমস্তই হচ্ছে উচ্চতর মানবিক গুণাবলী। স্নেহ ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কই সুন্দর হয়। কিন্তু কী ধরনের স্নেহ ভালোবাসা? এই ভালোবাসা কি ধনীর সম্পদের প্রতি ভালোবাসা কিংবা সুন্দরী মহিলার প্রতি শারীরিক আকর্ষণ? আপনারা ভালোবাসবেন, শ্রদ্ধা করবেন তাঁদেরকেই যাঁরা মানসিক সম্পদে বিত্তশালী, উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির মানুষ। তা না হলে এ হবে শুধুই প্রতারণা। প্রকৃত ভালোবাসা কখনও কোনও মানুষকে দুর্বল করে না, শক্তি জোগায়। কিন্তু বহু সাহিত্যে ভালোবাসা ও দুর্বলতাকে এক করে দেখানো হয় — ‘তোমার প্রতি আমি দুর্বল কারণ তোমায় আমি ভালোবাসি।’ ফলে সে যে ধরনেরই সংস্কৃতি, আচরণ, মানসিকতা দেখাক না কেন, যত খারাপ আচরণ করুক না কেন, আমার চোখে পড়ে না। আমি অন্ধ, আমি দুর্বল। একে কি প্রকৃত ভালোবাসা বলা যায়? কখনোই নয়। কিন্তু আমি নিজেকে শক্তিশালী মনে করি যখন আমার ভালোবাসা আদর্শ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। সত্যিকারের ভালোবাসা কখনও অন্ধ করে তোলে না, কারও অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে না, কাউকে পেছন থেকে টেনে ধরে না। বরং একজনকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে, সামাজিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করে, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যেহেতু আমি পিতৃত্বকে, সমস্ত পিতাকে ভালোবাসি, তাই আমি আমার পিতাকে ভালোবাসি। পিতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই আমি আমার বাবাকে শ্রদ্ধা করি। যেহেতু আমি মাতৃত্বের গুণগ্রাহী, তাই আমি আমার মাকে ভালোবাসি। যথার্থ মানবিক গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই আমার স্বামীর প্রতি আমার ভালোবাসা আসে। আমার সন্তানের প্রতি ভালোবাসাও একই ভাবে গড়ে ওঠে। এই হচ্ছে সর্বজনীন ভালোবাসার বিশেষ রূপ, বিশেষ প্রকাশ।

ভালোবাসার সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। আমার বাবার প্রতি আচরণ মায়ের প্রতি আচরণের থেকে আলাদা হয়ে যায়। আমার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও আমার ভায়ের প্রতি ভালোবাসার রূপ ও প্রকৃতি এক নয়। ভালোবাসা সেখানে আছে, কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গিমা এক নয়। কিন্তু ভালোবাসা যদি নীতি, নৈতিকতা, সংস্কৃতি এবং আদর্শচ্যুত হয়, তাহলে তা কথার কথা হয়ে যায়। গাছের শেকড় যদি কেটে দেওয়া হয়, তাহলে সেই গাছের পাতা, ফুল, ফল কিছুই থাকে না। যদি কেউ সামাজিক কর্তব্যবোধ, নৈতিকতা ও আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সে প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী হতে পারে না, সেখানে ভালোবাসার নামে প্রতারণা ঘটবে। একমাত্র সেই সত্যিকারের ভালোবাসা সকলকে দিতে পারে যে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিতে পেরেছে।

কমরেডস, কত দ্রুত পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে তার নিশ্চিত সাক্ষী আপনারা। বেশিরভাগ পরিবারে পারিবারিক সম্পর্কে আজ আর মাধুর্য নেই । চূড়ান্ত স্বার্থপরতা, নীচতা, অহংসর্বস্বতা, মূল্যবোধবিচ্যুত জীবন সকল পরিবারকে গ্রাস করছে। পুঁজিবাদী সমাজে যেমন পুঁজিই প্রভু তেমনি পরিবারেও টাকাই কর্তৃত্ব করে, এমনকি বৃদ্ধ বয়সের জ্ঞানের কোনও মূল্য নেই। যেমন পুঁজিবাদের একমাত্র লক্ষ্য অপরকে শোষণ করে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন, তেমনই পারিবারিক জীবনেও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রয়োজন বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থরক্ষা, আত্মতৃপ্তি ও আত্মভোগ একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সমাজে নৈতিকতার ক্ষেত্রে এক শূন্যতা বিরাজ করছে

বেশিরভাগ বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অত্যন্ত অভাব। আজকের বেশিরভাগ বিবাহিত জীবনে সংশয়, কলহ এবং শান্তির অভাবের কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। যার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সন্তানেরা। দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধ অসমর্থ পিতামাতারা উপার্জনশীল সন্তানের দ্বারা পরিত্যক্ত। কী বেদনাময় পরিস্থিতি! এইগুলি হচ্ছে আজকের মুমূর্ষু পুঁজিবাদী সভ্যতার কুৎসিত রূপ। উচ্চ মানবিক গুণাবলী, যেমন ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সূক্ষ্ম অনুভূতি, দায়িত্ববোধ এগুলো থাকতে পারে না যখন পুরো সমাজেই এগুলি শুকিয়ে যায়, সমাজে যখন নৈতিক মূল্যবোধ থাকে না। ব্যক্তিচেতনা হচ্ছে সামাজিক চেতনার মূর্ত প্রকাশ। সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় মূল্যবোধ আজ মৃত, বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ প্রায় নিঃশেষিত এবং সর্বহারা নৈতিক মূল্যবোধও বেশিরভাগ মানুষের জানা নেই। ফলে নৈতিকতার ক্ষেত্রে সমাজে সম্পূর্ণ শূন্যাবস্থা বিরাজ করছে।

এর ফলস্বরূপ অধঃপতিত বুর্জোয়া সংস্কৃতি এবং নীচ প্রবৃত্তি মানবজীবনের সবকিছুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে । নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি মানুষকে অমানবিক করে তুলছে। এই সমস্তগুলোই হচ্ছে সামাজিক ব্যাধির মূল কারণ। ফলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হবে, না হলে এই সংকটগুলি বাড়তেই থাকবে। ফলে চাই মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় শক্তিশালী বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা। এই লড়াইয়ে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, প্রয়োজনে প্রাণ দিতে হবে।

কমরেডস, আমি আপনাদের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের একটি আবেদন স্মরণ করাতে চাই, যিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মহিলা শহিদ। আপনারা কি জানেন, কেন তিনি মাত্র ২১ বছর বয়সে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন? তিনি ছিলেন গরিব পরিবারের সন্তান এবং তিনি একটি স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজও করতেন। সমস্ত বিসর্জন দিয়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই বার্তা পৌঁছাতে যে, মহিলারাও স্বাধীনতা আন্দোলনে লড়াই করতে পারে এবং স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারে। ভারতীয় নারীদের কাছে তাঁর আবেদন ছিল, তাঁরাও যেন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেই নিজের জীবন তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন। ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুর ঠিক আগে অবিস্মরণীয় বিপ্লবী ভগৎ সিং, ভারতীয় মায়েদের কাছে এক মর্মস্পর্শী আবেদন রাখেন। তিনি বলেন, তিনি হাসিমুখেই ফাঁসির রজ্জুকে বরণ করবেন এই আশা নিয়ে যে, এদেশের মায়েরা যেন ভগৎ সিং-এর মতো অনেক সন্তানের জন্ম দেন। বিপ্লবী কবি নজরুলও ভারতীয় মায়েদের কাছে আবেদন করেছিলেন, তাঁরা যেন সকলেই ক্ষুদিরামের মতো সন্তানের জন্ম দেন। এই আবেদনগুলি আজও অপূরিত থেকে গেছে। সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে ভারতীয় মায়েদের। আজ কমরেড শিবদাস ঘোষের আহ্বানে মার্কসবাদ এবং সর্বহারা নৈতিকতাকে হাতিয়ার করে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই আবেদনে আমরা সাড়া দিতে পারি।

সম্মেলনেই কর্তব্য শেষ নয়, নতুন সংগ্রামের শুরু

কমরেডস, রাজনৈতিক অজ্ঞতা, হতাশা, অনীহা এবং নৈতিক অধঃপতন যাই থাকুক না কেন এখনও একটা আশার রূপালি রেখা দেখা যাচ্ছে। জীবনের তীব্র সংকট জণগণকে, এমনকী মহিলাদেরও বেরিয়ে আসতে ও লড়াই করতে বাধ্য করছে। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর ও অন্যান্য জায়গায় যেখানেই অন্যায়ভাবে জমি অধিগ্রহণের প্রচেষ্টা হয়েছে সেখানকার অশিক্ষিত মহিলারা অকুতোভয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুরুষের সাথে লড়াই করেছে। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, নারকীয় অত্যাচার, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস বা বুলেট কোনও কিছুই এই মহিলাদের আন্দোলন থেকে পিছু হটাতে পারেনি। একসময় ভাবা হত দিল্লি রাজনীতির দিক থেকে অত্যন্ত উদাসীন এবং আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু এইবার আমরা দিল্লিকে অন্য রূপে দেখলাম। দিল্লির নৃশংস গণধর্ষণের ঘটনায় যে প্রতিবাদের আগুন জ্বলেছিল, তা সমগ্র দেশে ছড়িয়েছিল। যেভাবে বিপুল সংখ্যক মহিলা দিল্লির রাজপথে নেমে অসহ্য শীতে জলকামান, কাঁদানে গ্যাস, লাঠি চার্জ সবকিছুর সাথে বীরের মতো লড়াই করেছেন, তা সম্পূর্ণ নজিরবিহীন। আমরা নানা দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখছি, কিন্তু যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলিকে সঠিক নেতৃত্বের দ্বারা আদর্শগত, সংস্কৃতিগত উচ্চ তারে বেঁধে সুসংহত, সংঘবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে রূপ দেওয়া। দেশ আজ এই ধরনের নেতৃত্ব চাইছে। কেবলমাত্র আপনারাই পারেন এই নেতৃত্ব দিতে, যদি আপনারা নিজেদের কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারেন। তাই আপনাদের সকলের কাছে আমার আবেদন, সময়ের এই জরুরি প্রয়োজনে আপনারা সাড়া দিন। এখানে আমি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মহান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং এবং শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাকে আমার উপলব্ধি অনুযায়ী আপনাদের সামনে রাখলাম। সুতরাং এই সম্মেলনের সাথে সাথে আপনাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যাচ্ছে না, নতুন স্তরের সংগ্রামের শুরু হচ্ছে। ব্যক্তি হিসাবে আপনাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কিনা তার প্রতীক্ষায় থাকবেন না। আপনি নিজ উদ্যোগে দায়িত্ব গ্রহণ করুন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় যৌথভাবে এবং এককভাবে কাজ করতে শুরু করুন। সাহসের সাথে আপনারা আরও অধিক দায়িত্ব গ্রহণ করুন। অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন। বর্তমান পরিস্থিতি বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। জণগণ প্রতিবাদ করতে চাইছে, লড়াই করতে চাইছে, এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছে। প্রতিদিনই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হচ্ছে। প্রকৃত মুক্তিসংগ্রামের আলো দেখাতে পারে কে? একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই এটা পারে। এই মহান বিপ্লবী আদর্শের দ্বারা আপনারা লক্ষ লক্ষ মহিলাকে শিক্ষিত, অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করুন। আমি আশা করি, এই স্বপ্ন, এই মহান উদ্দেশ্য আপনারা সফল করতে পারবেন। এই কথা বলে আমি শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ

জানাচ্ছি এ আই এম এস এস-এর সমস্ত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের এবং যে কেরল রাজ্য কমিটি এই সম্মেলন সফল করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রশংসনীয়ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, তাঁদের।

উদ্ধৃতি সূত্র ঃ

১) পরিবারের উৎপত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্র — এঙ্গেলস
২) নারী ও সাম্যবাদ — লেনিন।
৩) নারী ও সাম্যবাদ — স্ট্যালিন।
৪, ৫) বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র (সংকলিত কাজ)।
৬) শিক্ষা — স্বামী বিবেকানন্দ।
৭) হরিজন- -- ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭।
৮) শিক্ষা — রবীন্দ্র রচনাবলী।
৯) দেশসেবা — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১০, ১১, ১২) শেষ প্রশ্ন — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৩, ১৪, ১৫) নারীমুক্তি প্রসঙ্গে — শিবদাস ঘোষ।